সূচিপত্র

ঐশী আলোকবর্তিকা ২৯

শুরুর কথা ৩০

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৩২

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংজ্ঞা ৪৪

প্রথম অধ্যায়

হালাল-হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি : বস্তুর মূল হলো বৈধ হওয়া ৪৮

দ্বিতীয় মূলনীতি : বিধান-প্রণয়নকারী একমাত্র আল্লাহ ৫৫

তৃতীয় মূলনীতি : হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা শিরক ৬০

চতুর্থ মূলনীতি : নিষিদ্ধতার কারণ নিকৃষ্টতা ও ক্ষতি ৬৫

পঞ্চম মূলনীতি : হালালের মধ্যে হারামের বিকল্প ৭০

ষষ্ঠ মূলনীতি : যা হারামের দরজা খুলে দেয় তা-ও হারাম ৭১

সপ্তম মূলনীতি : হারাম কাজে কৌশল করাও হারাম ৭২

অষ্টম মূলনীতি : ভালো নিয়তে করলেও হারাম কাজ হারামই ৭৩

নবম মূলনীতি : সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকুন ৭৭
দশম মূলনীতি : নিষিদ্ধ বিষয় সবার জন্যই হারাম ৭৯
একাদশ মূলনীত : বিকল্প না থাকলে নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ হতে পারে ৮৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম

খাবার ও পানীয় ৮৬
ব্রাহ্মণদের মতে পশু জবাই ও ভক্ষণ ৮৬
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে নিষিদ্ধ প্রাণী ৮৭
প্রাক-ইসলামি যুগে প্রাণীহত্যা ও অন্যান্য ৮৮
প্রাণীহত্যার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে ৮৯
মৃত জন্তুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও কারণসমূহ ৯১
প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম ও তার কারণ ৯২
শূকরের মাংস ৯৩
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী ৯৪
মৃত জন্তুর প্রকারভেদ ৯৪
কতিপয় প্রাণী হারাম হওয়ার কারণ ৯৬
পূজার বেদীতে বলি দেওয়া জন্তু ৯৭
পঙ্গপাল ও জলজ প্রাণীর ব্যাপারে ব্যতিক্রমী বিধান ৯৭
মৃত জন্তুর চামড়া, হাড় ও পশম ৯৯
বিশেষ পরিস্থিতির কথা ভিন্ন ১০১
চিকিৎসার প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার ১০৩
কারো কাছে অতিরিক্ত খাবার থাকলে হারাম বস্তু খাওয়া জায়িয নয় ১০৪
সামুদ্রিক সকল প্রাণীই হালাল ১০৬
নিষিদ্ধ যেসব স্থলজ প্রাণী ১০৭

গৃহপালিত প্রাণীর জন্য জবাই বাধ্যতামূলক ১১০
শারয়ি জবাইয়ের শর্তসমূহ ১১০
জবাইয়ের রহস্য ও কারণ ১১৪
কেন জবাইয়ের শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে হবে? ১১৬
ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের জবাইকৃত প্রাণী ১১৬

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ১১৮
গির্জায় ও খ্রিষ্টানদের উৎসবে জবাইকৃত প্রাণীর বিধান ১১৮
অগ্নিপূজারির হাতে জবাইকৃত প্রাণীর বিধান ১২০
অমূলক সংশয়ে কোনো অনুসন্ধান নয় ১২১

শিকারের ব্যাপারে ইসলামের বিধান ১২২
শিকারির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ১২৩
শিকারকৃত প্রাণীর ব্যাপারে শারয়ি বিধান ১২৫
শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ১২৬
ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে শিকার ১২৭
পশুপাখির মাধ্যমে শিকার ১২৯
মৃত শিকারের ব্যাপারে করণীয় ১৩২

মদের ব্যাপারে ইসলাম যা বলে ১৩৩
প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যই মদ ১৩৬
যা প্রচুর পানে নেশা হয়, তার সামান্যও হারাম ১৩৭
মদের ব্যবসা ১৩৭
কাউকে মদ উপহার দেওয়া হারাম ১৩৮
মদের আসর বর্জন করুন ১৩৯
মদ কোনো ওষুধ নয়, রবং একটি ব্যাধি ১৪০
নেশাজাতীয় বস্তু ১৪৩

ক্ষতিকর সকল বস্তুই হারাম ১৪৫

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা ১৪৭

পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ধর্ম ইসলাম ১৪৯

পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ও স্বর্ণ হারাম ১৫২

রেশমি কাপড় ও স্বর্ণ পুরুষের জন্য হারাম কেন? ১৫৬

নারীদের জন্য স্বর্ণালংকার বৈধ কেন? ১৫৭

কেমন হবে মুসলিম নারীদের পোশাক? ১৫৮

বিপরীত লিঙ্গের বেশভূষা গ্রহণের বিধান ১৬০

অহংকারবশত পোশাক পরিধান ১৬১

স্রষ্টাপ্রদত্ত আকৃতির পরিবর্তন ১৬৩

ট্যাটু আঁকা, দাঁত সরু করা ও প্লাস্টিক সার্জারি ১৬৩

ভ্রু প্লাক করা ১৬৫

কৃত্রিম চুলের ব্যবহার ১৬৭

সাদা চুল ১৭০

দাড়ি বড় হতে দিন ১৭২

ঘর-বাড়ি-বাসস্থান **১৭৭**

বিলাসিতা ও পৌত্তলিকতা ১৭৮

সোনা-রুপার পাত্র ১৮০

প্রতিকৃতির ব্যবহার হারাম ১৮৩

ছবি-প্রতিকৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন? ১৮৪

সম্মান প্রদর্শনে অতিরঞ্জন বর্জনীয় ১৮৭

অসম্পূর্ণ মূর্তির ব্যাপারে বিধান ১৯৫

দেহবিহীন চিত্রের বিধান ১৯৬

যেসব স্থানে চিত্রের ব্যবহার বৈধ ২১৩

ডিজিটাল ছবির ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? ২১৫
আধুনিক ছবি ও তার বিষয়বস্তু ২১৭
চিত্র এবং চিত্রশিল্পীর ব্যাপারে শারয়ি বিধান ২১৯
বিনা কারণে কুকুর পালন ২২২
প্রয়োজনের খাতিরে কুকুর পোষা বৈধ ২২৩
কুকুর পোষার ব্যাপারে বিজ্ঞান কী বলে? ২২৫

উপার্জন ও পেশা ২২৮
কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক ২২৮
ভিক্ষা কখন বৈধ? ২৩০
পেশা ও শ্রমের মর্যাদা ২৩২
চাষবাসের মাধ্যমে উপার্জন ২৩৩
নিষিদ্ধ চাষবাস ২৩৭
শিল্প ও অন্যান্য পেশা ২৩৮
যেসব পেশা সম্পূর্ণ হারাম ২৪৬
পতিতাবৃত্তি ২৪৬
অশ্লীল শিল্পকর্ম ও তার বিধান ২৪৭
চিত্রশিল্পী, ক্রুশ ও ভাস্কর্য নির্মাণকারী ২৪৮
মাদকের সাথে জড়িত সবার ওপর লানত ২৪৯
ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ ২৫০
ব্যবসার ব্যাপারে গির্জার অবস্থান ২৫৯
কোন কোন ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ? ২৬০
পেশা যখন চাকরি ২৬৩
যেসব চাকরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ২৬৬
জীবিকার মূলনীতি ২৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনে হালাল-হারাম

জৈবিক চাহিদা ২৭০

ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না ২৭২

গায়রে মাহরাম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান ২৭২

বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি কামনাপূর্ণ দৃষ্টি ২৭৬

সবার জন্য উন্মুক্ত গোসলখানায় নারীদের প্রবেশ ২৭৯

নারীদের সৌন্দর্য-প্রদর্শন হারাম ২৮২

তাবাররুজ (সৌন্দর্য প্রদর্শন) ২৮৩

নারীদের পর্দানশিন হওয়ার উপায় ২৮৪

পোশাকের ব্যাপারে শারয়ি নির্দেশনা ২৮৫

বিকৃত যৌনতা ইসলামে জঘন্যভাবে নিষিদ্ধ ২৯৩

হস্তমৈথুনের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? ২৯৫

বিয়ে ২৯৭

ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই ২৯৭

বিয়ের জন্য নারীদের দেখা যাবে কি? ৩০২

বিয়ের প্রস্তাব যখন হারাম ৩০৫

বিয়েতে কুমারি মেয়ের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক ৩০৭

মাহরাম নারীগণ ৩০৯

রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম নারীগণ ৩১০

মাহরাম নারীদের বিয়ে করা হারাম কেন? ৩১০

দুধ-সম্পর্কিত কারণে মাহরাম নারীগণ ৩১২

বিয়ে-সম্পর্কিত কারণে মাহরাম নারীগণ ৩১৩

দুই বোনের একই স্বামী ৩১৪

অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী ৩১৫

মুশরিক নারী	৩১৮
কিতাবি নারীদেরকে বিয়ে	৩১৯
কিতাবি নারীদের বিয়েতে শর্তসমূহ	৩২১
অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীর বিয়ে	৩২২
পতিতা নারী	৩২৪
মুতআ বিয়ে	৩২৮
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ	৩৩০
একাধিক বিয়েতে সমতা বাধ্যতামূলক	৩৩২
একাধিক বিয়ের বৈধতা বনাম যৌক্তিকতা	৩৩৪
দাম্পত্য সম্পর্ক	**৩৩৫**
স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক	৩৩৬
সহবাসে মলদ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ	৩৩৮
স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা	৩৪১
জন্মনিয়ন্ত্রণ	**৩৪৩**
জন্মনিরোধ বৈধ হওয়ার কারণগুলো	৩৪৭
গর্ভপাত	৩৫২
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার	৩৫৪
দম্পতির পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা	৩৫৭
স্ত্রী অবাধ্য হলে করণীয়	৩৫৮
তালাকের বৈধতা	৩৬২
ইসলামপূর্ব যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ	৩৬৩
ইহুদি ধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ	৩৬৩
খ্রিস্টধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ	৩৬৪
তালাকের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের মতভেদ	৩৬৫
খ্রিস্টধর্মে তালাক বিষয়ক কঠোরতার পরিণতি	৩৬৬

সাময়িকের জন্য খ্রিষ্টীয় নিষেধাজ্ঞা ৩৬৭
তালাক হ্রাসে শারয়ি বিধিনিষেধ ৩৬৯
হায়িয বা নিফাসের সময় তালাক নিষিদ্ধ ৩৭০
নিষিদ্ধ সময়ে তালাকের বিধান ৩৭২
তালাকের নামে শপথ হারাম ৩৭৩
ইদ্দত পালনের সময় স্ত্রী কোথায় থাকবে? ৩৭৫
তালাক হবে তিন বারে ৩৭৬
ইদ্দতের পর কী করণীয়? ৩৭৯
তালাকপ্রাপ্তা নারী পছন্দমতো বিয়ে করতে পারবে কি? ৩৮০
নাখোশ স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারবে? ৩৮১
স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া হারাম ৩৮২
স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগের শপথ বৈধ নয় ৩৮৩

পিতামাতা ও সন্তান ৩৮৬
ইসলাম বংশ-সংরক্ষণের পক্ষে ৩৮৬
স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ব্যাপারে শারয়ি বিধান ৩৮৭
দত্তক সন্তান কি আপন সন্তানের স্বীকৃতি পাবে? ৩৮৮
জাহিলি দত্তকের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ৩৮৯
মৌখিক ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন ৩৯২
লালনপালন ও দেখভালের জন্য দত্তক-গ্রহণ ৩৯৪
কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? ৩৯৫
আপন বাবা ছাড়া অন্যকে বাবা বলা যাবে কি? ৩৯৬
সন্তানদের হত্যা কোরো না ৩৯৭
সন্তানদের মাঝে সমতা বাধ্যতামূলক ৪০০
মিরাস বণ্টনে শারয়ি বিধান ৪০২
পিতামাতার অবাধ্যতা কবিরা গুনাহ ৪০৪

পিতামাতার সম্মানহানি করা কবিরা গুনাহ ৪০৮
পিতামাতার অনুমতি ছাড়া নফল জিহাদে যাওয়া যাবে কি? ৪০৮
পিতামাতা মুশরিক হলে করণীয় ৪১১

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক জীবনে হালাল-হারাম

আকিদা ও বিশ্বাস **৪১৩**
সবার ওপরে ইসলাম ৪১৩
ভিত্তিহীন কথার বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ ৪১৪
জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করা কুফুরি ৪১৬
তিরের মাধ্যমে ভাগ্য-পরীক্ষা ৪১৮
জাদুবিদ্যা ৪১৯
তাবিজ ব্যবহার কতটুকু শরিয়তসম্মত? ৪২৩
অশুভ লক্ষণ ৪৩০
জাহিলি রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৪৩৪
ইসলামে গোত্র-প্রীতির কোনো স্থান নেই ৪৩৪
বর্ণ-গোত্রের বিচারে সবাই সমান ৪৩৮
মৃতদের জন্য বিলাপ করা যাবে কি? ৪৪১

পারস্পরিক লেনদেন **৪৪৪**
নিষিদ্ধ বস্তু কেনাবেচা হারাম ৪৪৫
প্রতারণাপূর্ণ বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৪৪৬
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ৪৪৯
মজুতকারীদের ওপর লানত! ৪৫১
দালালের কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ৪৫৪
দালালি বা মধ্যস্থতা করা কি বৈধ? ৪৫৭

বাণিজ্যিক কাজে সুযোগসন্ধান ও প্রতারণা হারাম ৪৫৮
কোনো প্রতারক ব্যক্তি নবিজির উম্মত নয় ৪৬০
অতিরিক্ত শপথ বৈধ নয় ৪৬২
ওজনে কমে দেওয়ার পরিণতি ৪৬২
চোরাই ও ছিনতাইকৃত পণ্য কেনা বৈধ নয় ৪৬৪
সুদ একটি জঘন্য অপরাধ ৪৬৫
সুদ কেন এত বেশি ভয়াবহ? ৪৬৭
সুদের সাথে জড়িতদের ওপর আল্লাহর লানত! ৪৬৯
ঋণ থেকে পানাহ চাইতেন নবিজি ৪৭০
বাকির পণ্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা কি বৈধ? ৪৭৩
আকদে সালাম—আগে মূল্য, পরে পণ্য ৪৭৪
মুদারাবা—একজনের শ্রম, আরেকজনের পুঁজি ৪৭৫
শিরকত—যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ ৪৭৭
তা'মিন—ইন্স্যুরেন্স বা বীমা ৪৭৮
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি ইসলাম-সম্মত? ৪৮০
ইন্স্যুরেন্সকে বৈধ করা করার উপায় ৪৮১
ইসলামে ইন্স্যুরেন্স-ব্যবস্থা ৪৮২
আবাদি জমি কাজে লাগানো ৪৮৩
জমি কাজে লাগানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ৪৮৩
জমি ইজারা দেয়া কি বৈধ? ৪৯৬
পশুপালনে শরিকানা বৈধ কি? ৫০২

খেলাধুলা ও বিনোদন ৫০৪
কিছু সময় দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা ৫০৫
নবিজিও একজন মানুষ ৫০৬
অন্তরও ক্লান্ত হয় ৫০৮

হালাল খেলাধুলা ৫১০
দৌড় প্রতিযোগিতা ৫১০
কুস্তি লড়াই ৫১১
তিরন্দাজি ৫১২
বর্শা নিক্ষেপণ ৫১৪
অশ্বারোহণ ও ঘোড়দৌড় ৫১৮
শিকার ৫২২
পাশা খেলা ৫২৪
মদের সঙ্গী জুয়া ৫২৬
লটারি এক ধরনের জুয়া ৫২৯

সামাজিক সম্পর্ক ৫২৯
মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিচ্ছেদ বৈধ নয় ৫৩১
বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে মীমাংসা ৫৩৭
ঠাট্টা-বিদ্রুপ গুনাহের কাজ ৫৩৮
দোষারোপ করা ও খোঁচা দেওয়া ৫৪০
কাউকে মন্দ নামে ডাকা ৫৪১
কারো প্রতি কুধারণা করা ৫৪১
অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো ৫৪৩
গিবত একটি জঘন্য অপরাধ ৫৪৮
কোন কোন ক্ষেত্রে গিবত করা জায়িয/ বৈধ? ৫৫১
চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না ৫৫৫
মান-সম্মান হিফাযত করা ৫৫৮
মানবহত্যা মারাত্মক গুনাহ ৫৬১
হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজনেই জাহান্নামি ৫৬৪
নির্বিচারে হত্যা কখনো বৈধ নয় ৫৬৬

কোন কোন ক্ষেত্রে মানবহত্যা বৈধ? ৫৬৮
আত্মহত্যা মহাপাপ ৫৭১
মুমিন কি সম্পদশালী হতে পারবে? ৫৭৩
ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার ওপর নবিজির লানত ৫৭৫
বিচারকদের জন্য জনগণের উপহার ৫৭৮
জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেওয়া কি বৈধ? ৫৮০
ব্যক্তিগত সম্পদের অপচয় নিষিদ্ধ ৫৮১

অমুসলিমের সঙ্গে মুসলিমের সম্পর্ক ৫৮৫
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিশেষ কিছু আলোচনা ৫৮৮
আহলে কিতাব যখন চুক্তিবদ্ধ ৫৯১
অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কি বৈধ? ৫৯৩
অমুসলিম থেকে সহায়তা গ্রহণ ৫৯৭
ইসলামের দয়া সর্বজনীন ৬০১

পরিশিষ্ট ৬০৫
লেখক পরিচিত ৬১৭
গ্রন্থপঞ্জি ৬১৮

শুরুর কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সাহাবিগণ, পরিবার-পরিজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তার সকল অনুসারীর ওপর।

এটি এই বইয়ের সত্তরোর্ধ্ব সংস্করণ। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সবাইকে এর মাধ্যমে উপকৃত করেন এবং পাঠকগণ যেন ভ্রান্ত চিন্তা, ভুল মতবাদ ও পরিত্যাজ্য মতামত উপেক্ষা করে সর্বদা সঠিক বিধান অনুসারে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

এ ধরনের বই প্রকাশে উদ্যোগের গুরুত্ব ও মূল্য আরো বেড়ে যায়, যখন আমরা দেখি, ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রচুর শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করা হচ্ছে, অসংখ্য শয়তানি শক্তি এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; নানা উপায়ে, নিত্যনতুন পন্থায়, বিভিন্ন মোড়কে ও পোশাকে এই দ্বীনকে দমিয়ে রাখতে, দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে, দাঈদের পথ রুদ্ধ করতে, দ্বীন সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহের বীজ বপনে, আকিদা, বিধিবিধান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃতিতে তারা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে শয়তানি কর্মকাণ্ডের জয়জয়কার। মুসলিমদের কীভাবে কুফরে লিপ্ত করা যায়, সেজন্য নানা কার্যক্রম তীব্র বেগে ধাবমান। ঠিক সেই মুহূর্তে এই বইটি প্রকাশনা জগতে ও বিভিন্ন বুকসেলিং সাইটে দীর্ঘ সময় ধরে বেস্ট সেলার হিসেবে তার স্থান

ধরে রাখতে পেরেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও প্রচারমাধ্যম থেকে এই তথ্য জানতে পেরে আমরা ভীষণরকম আনন্দিত। এজন্য মনের গভীর থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করি। বহু রচনা ও সংকলন রয়েছে, যার প্রচার-প্রসারে এবং বিক্রি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠনের পক্ষ থেকে হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, তবু বাজার তাদের অনুকূলে যায়নি এবং পাঠকের সমাদর তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, যার শুকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি এর মাধ্যমে আমরা এ তথ্যও পেলাম যে, আমাদের মুসলিম ভাইবোনেরা এখনো কল্যাণের মধ্যেই আছেন; অন্যায়-অনাচার ও অবিচার কেবল শাসক ও নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমিত, যারা মূলত সাধারণ মুমিনদের কাঁধে চেপে বসেছে। আর অবশ্যই এরা একদিন ধ্বংস হবে।

আমার কাছে আরো ভালো লেগেছে, পাকিস্তান ও তুরস্কের কিছু ভাই বইটি অনুবাদের অনুমতি চেয়ে পত্র পাঠিয়েছেন; বিনা দ্বিধায় আমি তাদের অনুমতি দিয়েছি। কারণ আমার চিন্তা হলো, ভাষা যেন মুসলিম ভাইদের পরস্পরের ভাবনা-চিন্তা আদান-প্রদানে কখনোই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। মুসলিমদের ঐক্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম উপায় হলো, ভাষার এই সীমাবদ্ধতা দূর করা।

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। তিনি যদি আমাদের হিদায়াত প্রদান না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর, আপনি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দেবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন; নিশ্চয়ই আপনি সুমহান দাতা।[১]

ইউসুফ আল-কারযাবি

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৮

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংজ্ঞা

হালাল (বৈধ)

এমন বৈধ কাজ, যাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি এবং শরিয়ত-প্রণেতা এর অনুমতি দিয়েছেন।

হারাম (অবৈধ)

শরিয়ত-প্রণেতা যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধের সীমালঙ্ঘনে বান্দা আখিরাতে আল্লাহ তাআলার শাস্তির সম্মুখীন হবে। কখনো কখনো দুনিয়াতেও শারয়ি শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে।

মাকরুহ (ঘৃণ্য)

শরিয়ত-প্রণেতা কোনো বিষয় থেকে বারণ করেছেন, কিন্তু বারণের মধ্যে কঠোরতা আরোপ করেননি, একে বলা হয় মাকরুহ। নিষিদ্ধতার বিবেচনায় এটি হারাম থেকে কিছুটা কম, এতে জড়ানোর শাস্তি হারামের মতো নয়, তবে অতিরিক্ত মাকরুহে জড়ালে এবং একে হালকাভাবে নেওয়ার প্রবণতা হারাম কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

স্রষ্টাপ্রদত্ত আকৃতির পরিবর্তন

সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। অনেক সময় মেয়েরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্রষ্টা-প্রদত্ত নিজস্ব আকৃতিও পরিবর্তন করে ফেলে। এমনটা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং কুরআনে একে শয়তানের প্ররোচনা বলা হয়েছে। কুরআনুল কারিমে শয়তানের উক্তি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—

...وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ...﴿١١٩﴾

আর আমি অবশ্যই তাদেরকে (প্ররোচনার মাধ্যমে) নির্দেশ দেবো; ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।[১]

ট্যাটু আঁকা, দাঁত সরু করা ও প্লাস্টিক সার্জারি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ-প্রদত্ত সৃষ্টির বিকৃতি সাধন সম্পূর্ণরূপে হারাম। শরীরে ট্যাটু করা, উল্কি আঁকা, দাঁত কেটে সরু করা-সহ সবই আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতির শামিল। যে উল্কি অঙ্কন করে, যার শরীরে উল্কি অঙ্কন করা হয়, যে দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে, যার দাঁত কেটে ফাঁক তৈরি করা হয়—সবার প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى ، مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেন সেসব নারীদের ওপর, যারা (অন্যদের) শরীরে উল্কি অঙ্কন করে দেয়, নিজেদের শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়, যারা যারা নিজেদের চুল-ভ্রু উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। (আব্দুল্লাহ

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

> ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,) আমি কেন তাদেরকে অভিসম্পাত করব না, যাদেরকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন![১]

উল্কির মাধ্যমে মূলত মুখ ও হাতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অনেক আরব নারীরা তাদের প্রায় সারা শরীরে উল্কি আঁকত। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন মূর্তি, নিদর্শন ও অক্ষর শরীরে আঁকিয়ে নিত। যেমন : খ্রিষ্টানরা তাদের হাতে, বুকে ক্রুশের ট্যাটু আঁকায়। এসব ট্যাটু ও উল্কির শারয়ি অবৈধতা ছাড়াও শারীরিকভাবেও কষ্ট হয়। সুঁই দিয়ে শরীরে বারবার ছিদ্র করা হচ্ছে, আধুনিক সময়ে এসে দেওয়া হচ্ছে বিষাক্ত সব ক্যামিকেল; এ কারণে মূলত উল্কিকারী এবং যে উল্কি করাতে চায়, দুজনই অভিসম্পাতের উপযুক্ত।

যে দাত সরু করে এবং যে করাতে বলে তাদের সবার ওপরে নবিজির লানত। যে নারী এসব কাজ করে এবং যে করায় দুজনই অভিশপ্ত। কোনো পুরুষ এসব কাজ করলে সে আরো আগে এই অভিসম্পাতের ভাগিদার হবে।

সুচালোকারী নারীর মতো দাঁত কেটে কৃত্রিমভাবে দাঁত ফাঁকাকারীর প্রতিও আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত বর্ষিত হয়।

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى

> (আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেন) যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে।[২]

সৃষ্টিগতভাবেই অনেক নারী এমন ফাঁকা দাঁত নিয়ে জন্মায়, আবার অনেকের দাঁত এমন ফাঁকা থাকে না। এই দ্বিতীয় শ্রেণির নারীরা কৃত্রিমভাবে তাদের দাঁত ফাঁকা করার চেষ্টা করে থাকে। এটি এক ধরনের প্রতারণা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। এমন প্রতারণা বা বাড়াবাড়ি কোনোটাই ইসলাম সমর্থন করে না।

এসব বিশুদ্ধ হাদিস থেকে সৌন্দর্য বর্ধনের নামে আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির বিধানও

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৩১; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৫

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৩১; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৫

স্পষ্ট হয়ে যায়। অধুনা পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার চাপে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের নামে যাচ্ছেতাই করার মানসিক অসুস্থতা ঢুকে পড়েছে। নাক-কান, চোখ-মুখ-সহ স্তন ইত্যাদির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হওয়ার এক অদম্য বাসনা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। অস্ত্রোপচারের পেছনে তারা কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করেন। এগুলো যারা করে, সবাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিসম্পাতের আওতাভুক্ত হবে। কারণ, এমন কাজ শুধু তারাই করতে পারে, যারা মন নয়, বরং দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে আছে। ভেতর নয়, বরং বাহির নিয়ে চিন্তিত। আত্মা নয়, বরং দেহ ও মুখচ্ছবি বিষয়ে সীমাতিরিক্ত সচেতনতায় লিপ্ত।

তবে যদি কারো এমন বিরল রোগ থাকে, যেমন অতিরিক্ত অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা এবং এতে বিভিন্ন সময় তার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হয়, তাহলে এর চিকিৎসায় কোনো বাধা-নিষেধ নেই। যতদিন এটি তার জন্য কষ্টের কারণ হবে, ততদিন সে এর চিকিৎসা করাতে পারবে। দ্বীন আমাদের জন্য কোনো বোঝা নয়, বোঝা হলো—আমাদের অসুস্থ মানসিকতা।

অতিরিক্ত আঙুল কেটে ফেলার মৌন সমর্থন পাওয়া যায় সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ফাঁকাকারীদের প্রতি অভিসম্পাতের হাদিস থেকে। সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করছি—এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ফাঁকা করা হলো নিন্দনীয়, কিন্তু অসুস্থতা বা কোনো ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচতে দাঁত ফাঁকা করা হলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

ভ্রু প্লাক করা

সৌন্দর্যের জন্য নিষিদ্ধ একটি কাজ হলো—ভ্রু চিকন বা প্লাক করা। ভ্রু চিকন করার অর্থ হলো—ভ্রু উঁচু বা সমান বানানোর জন্য ভ্রুর কিছু পশম কেটে ফেলা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রু চিকনকারী এবং যার ভ্রু চিকন করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

> আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করুন সেসব নারীর ওপর, যারা (অন্যদের) শরীরে উল্কি অঙ্কন করে দেয় এবং যারা নিজেদের শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়, যারা (অন্যদের) মুখের চুল-ভ্রু তুলে দেয় এবং যারা নিজেদের মুখের চুল-ভ্রু উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে।[১]

ভ্রু উপড়ে ফেলে তা চিকন করার নিষেধাজ্ঞা আরো অধিক কঠোর হবে, যদি এটি নির্লজ্জ, ফাসেক-ফুজ্জার ও অমুসলিম নারীদের ভূষণ হিসেবে কখনো নির্ধারিত হয়ে যায়।

হাম্বলি মাযহাবের কিছু আলিম বলেন, ভ্রু ছাড়া মুখের অন্যান্য পশম উপড়ানো, পাউডার, ক্রিম, মেহেদি ইত্যাদি মেয়েরা ব্যবহার করতে পারবে স্বামীর অনুমতিক্রমে। কারণ, এগুলো স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অংশ। মুখের পশম উপড়ানোর ক্ষেত্রে ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর অবস্থান কিছুটা কঠোর। তার মতে মুখের পশমও উপড়ানো যাবে না। তার দৃষ্টিতে এটা ভ্রু চিকন করার নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। তবে ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা তার এ কঠোর অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ النامصة এর ব্যাখ্যায় বলেন—

وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ

> আর (হাদিসে উল্লেখিত) 'নামিসা' হলো সেই নারী, যে ভ্রুর ওপর নকশা করে তাকে চিকন করে ফেলে।[২]

অতএব চেহারার পশম উপড়ে ফেলাটা ভ্রু চিকন-বিষয়ক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়বে না।

আবু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রী থেকে বর্ণিত—

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى،

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২১২৫; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৪৮৩৩

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪১৭০

তিনি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাকে একজন নারী জিজ্ঞেস করল, হে উম্মুল মুমিনিন, আমার চেহারায় অনেক (অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত) পশম আছে। আমি কি আমার স্বামীর জন্য সাজুগুজু করার উদ্দেশ্যে তা তুলে ফেলতে পারব? আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তোমার (চেহারা) থেকে এসব অবাঞ্ছিত পশম সরিয়ে ফেলো।[১]

কৃত্রিম চুলের ব্যবহার

সৌন্দর্য-সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়ের তালিকাভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো, পরচুলা বা কৃত্রিম চুলের ব্যবহার। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম চুল উভয়টির ব্যবহারই নিষিদ্ধ। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকেই আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, তার বোন আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন—

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ

> যে নারী (অন্যের মাথায়) পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন।[২]

যেখানে নারীদের জন্য পরচুলা বা আলগা চুল ব্যবহারের অনুমতি নেই, সেখানে পুরুষের জন্য এমন কিছুর অনুমতি দানের প্রশ্নই আসে না। পুরুষ যদি আলগা চুল লাগিয়ে দেয়, তাহলে তার তো গুনাহ হবেই, পাশাপাশি যেসব বালকরা মেয়েদের মতো হওয়ার জন্য বড় চুল ব্যবহার করে, তারা তো আরো আগে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

এ ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি যার চুল পড়ে যাচ্ছে বা যে মেয়ে

---

[১] *মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক* : ৫১০৪; *মুসনাদু ইবনিল জাদ* : ৪৫১; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৪০; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৪

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছে, তাকেও তিনি অন্যের চুল ব্যবহারের অনুমতি দেননি।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ

> এক আনসারি নারীর বিয়ে হলো। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হয়; ফলে তার চুল পড়ে গেল। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন ওই নারীকে, যে (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায় এবং যে (অন্যের মাথায়) পরচুলা লাগিয়ে দেয়।[১]

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا ، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ

> এক নারী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, হাম-গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে আমার এক মেয়ের মাথার চুল পড়ে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি; এখন কি আমি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেবো? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন ওই নারীকে, যে (অন্যের মাথায়) পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে (নিজের মাথায়) পরচুলা লাগায়।[২]

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন—

قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا ، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৩৪; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৪১; *সহিহ মুসলিম* : ২১২২

> মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু শেষবারের মত যখন মদিনায় আসেন, তখন তিনি আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। এরপর তিনি এক গোছা চুল বের করে বললেন, আমি ইহুদি ছাড়া অন্য কাউকে এ জিনিস ব্যবহার করতে দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে অর্থাৎ পরচুলা ব্যবহারকারী নারীকে প্রতারক বলেছেন।[১]

হুমাইদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনি আওফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

> তিনি হজের মওসুমে মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন। ওই সময় তিনি এক দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের জিনিস (ব্যবহার করা) থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, বনি ইসরাইল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা এটা (পরচুলা) ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে।'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরচুলা ব্যবহারকারীকে 'প্রতারক' বলে অভিহিত করেছেন। এথেকে এটা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার কারণ স্পষ্ট হলো। পরচুলা বা আলগা চুলের ব্যবহার বস্তুত এক ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ইসলাম ধোঁকা ও প্রতারণার অনুমোদন দেয় না। প্রতারণামূলক সব ধরনের লেনদেন ইসলামে হারাম; সেই প্রতারণা হোক বস্তুগত বা অবস্তুগত। হাদিসে এসেছে—

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

> আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৩]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৩২; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৭

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ১০১; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২১৫৫

বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ও ব্যাখ্যাকার ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এসব বিষয়ে এত কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি আসার কারণ হলো দুটি। এক. এতে প্রতারণা ও ধোঁকার সুযোগ আছে। কোথাও যদি প্রতারণার সুযোগ বা ছাড় দেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণার দুয়ার খুলে যাবে। দুই. এতে সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে 'এরা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনকারী' বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।'[১]

হাদিস থেকে বোঝা গেল, চুলের সঙ্গে যদি পরচুলা বা আলগা চুল লাগানো হয়—হোক সেটা কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক—সেটা প্রতারণা ও ধোঁকার মধ্যে পড়বে। কিন্তু যদি চুলের সঙ্গে চুল ছাড়া অন্য কোনো কাপড়ের টুকরো, সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে সেটা এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

এ ব্যাপারে সাইদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ

> নারীদের জন্য রেশমি ও পশমী সুতার কৃত্রিম চুল ব্যবহারে দোষ নেই।[২]

সাদা চুল

সৌন্দর্য-সংক্রান্ত আরেকটি বিষয় হলো—সাদা চুল বা দাড়ি রং করা। বর্ণিত হয়েছে, ইহুদি ও খ্রিষ্টান কিতাবিগণ চুল রাঙানোকে অত্যন্ত দূষণীয় হিসেবে দেখত। তারা মনে করত, এগুলো ধার্মিকতা ও দ্বীনদারির সাথে যায় না। তাদের পাদরি ও সন্ন্যাসীদেরকে এভাবেই জীবনযাপন করতে দেখা যায়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদেরকে তাদের আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে বারণ করেছেন, যাতে জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ক্ষেত্রে মুসলিমদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বজায় থাকে।

ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৮০

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪১৭১; বর্ণনাটি হাসান।

إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ

> নিশ্চয়ই ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা (চুল ও দাড়িতে) রং লাগায় না; কাজেই তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।[১]

এই নির্দেশটি অবশ্য মুস্তাহাব পর্যায়ের। সাহাবিদের অবস্থান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যেমন আবু বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ খিজাব লাগিয়েছেন, আবার অন্যদিকে আলি, উবাই ইবনু কাব, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম খিজাব ব্যবহার করেননি। খিজাব হিসেবে কী ব্যবহার করতে হবে? কালো খিজাব ব্যবহার করা যাবে কি?

অতিবৃদ্ধ, যার চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য কালো খিজাবের ব্যবহার উপযুক্ত নয়। এ কারণে মক্কাবিজয়ের দিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাবা আবু কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বহন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাশফুলের মতো সাদা চুল-দাড়ির তাকিয়ে বললেন—

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

> একে (অর্থাৎ তার সাদা চুল-দাড়িকে) একটা কিছু দিয়ে পাল্টে দাও, তবে কালো রং থেকে দূরে থাকো।’[২]

কেউ যদি আবু কুহাফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বয়সি না হয়, তবে তার জন্য কালো খিজাব ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যখন (আমাদের) চেহারা কচি ছিল, তখন আমরা কালো খিজাব ব্যবহার করতাম, কিন্তু যখন চেহারা শুষ্ক হলো ও দাঁত নড়বড়ে হয়ে গেল, তখন আমরা তা বর্জন করলাম।’[৩]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৮৯৯; *সহিহ মুসলিম* : ২১০৩

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২১০২; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২০৪

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৫৫

কুকুর পোষার ব্যাপারে বিজ্ঞান কী বলে?

কুকুরের মতো বিশ্বস্ত, পোষ্য এবং শান্তশিষ্ট এই প্রাণীটির প্রতি ইসলামের এত সতর্ক অবস্থান অনেক পশ্চিমে-মুগ্ধ ব্যক্তিদের কাছে অপছন্দনীয়। তারা সকল-জীবে দয়াশীল ও উন্নত মানবতার ধ্বজাধারী! তাদের উদ্দেশ্যে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান লেখা এখানে পেশ করছি। এটি একজন জার্মান বিজ্ঞানীর লেখা। তিনি কুকুর পালন এবং কুকুরের সংস্পর্শে এলে কী কী সমস্যা হতে পারে, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন—

'বিগত কয়েক বছর ধরে কুকুর পালনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কুকুরবাহিত রোগব্যাধি। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বিশেষ করে অনেকে কুকুর লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না; তারা কুকুরের সাথে খেলাধুলা করছে, সেগুলোকে চুমু খাচ্ছে, ছোট বড় সবার হাতও কুকুর চাটছে। অনেকসময় মানুষের খাবার পাত্রেই কুকুরকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা বাদ দিলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুস্থ রুচির সঙ্গেও এসব আচার-আচরণ যায় না, তবে এটি যেহেতু একটি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধ, তাই শিষ্টাচার-সংশ্লিষ্ট আলোচনা আমরা এখানে করব না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেটা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়, কুকুর পালন এবং এর সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কোনো হালকা বিষয় নয়। প্রথম দিকে এসব বিষয় উপেক্ষার ফলে পরে চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ, কুকুরের মধ্যে লম্বাকৃতির এক ধরনের কৃমি রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে এবং কখনো কখনো এর ফলে মানুষের মৃত্যুও ঘটে।

এ ধরনের ভয়ানক পরজীবী কৃমিগুলো মানুষ, গবাদি পশু এবং শূকরের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে পরিপূর্ণ আকৃতিতে দেখা যায় কেবল কুকুর, ভাল্লুক ও নেকড়ের মধ্যে। বিড়ালের মধ্যেও দেখা যায়, তবে খুবই কম। এই কৃমিটি অন্য অন্য কৃমির চেয়ে খুবই সূক্ষ্ম এবং খালি চোখে দেখা যায় না; খুব সম্প্রতিই এটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, জৈবিকভাবে এই কৃমির বিকাশ প্রক্রিয়া কিছুটা অদ্ভুত। এদের

দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতগুলোতে একটি কৃমি 'অনেকগুলো মাথা'র জন্ম দেয়, যা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের ক্ষত ও ফোড়া তৈরি করে। এই 'মাথাগুলো' কেবল কুকুরের টনসিলে পূর্ণবয়স্ক কৃমিতে পরিণত হয়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে তারা তাদের মূল ক্ষত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষত এবং ফোড়া হিসেবে দেখা দেয়। প্রাণীতে একটি ফোড়ার আকার আপেলের সমান হয়; কিন্তু সংক্রামিত প্রাণীর লিভার তার স্বাভাবিক আকার থেকে পাঁচ থেকে দশগুণ পর্যন্ত বড় হয়ে যেতে পারে। মানুষের মধ্যে ফোড়ার আকার মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে শিশুর মাথার মতো বড় হতে পারে। এই ফোড়া দশ থেকে বিশ পাউন্ড ওজনের হলুদ তরল দিয়ে পূর্ণ থাকে। এটি সংক্রামিত মানুষের ফুসফুস, পেশি, প্লীহা, কিডনি ও মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এটি এতো বেশি আকার পরিবর্তন করে যে, নিকট অতীতেও এটি শনাক্ত করতে গলদঘর্ম হতে হতো।

যাহোক, এই প্রদাহ ও কৃমি মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীবনের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারটি হলো—এই কৃমিগুলোর উৎস, বিকাশ ও গঠন সম্পর্কে সবকিছু জানা সত্ত্বেও আমরা এর প্রতিকার উদ্ভাবন করতে পারিনি। ক্ষেত্রবিশেষ এই পরজীবীরা এমনিতেই মারা যায়। সম্ভবত মানুষের শরীরে থাকা অ্যান্টিবডির জন্য এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই এই ধরনের পরজীবী মারা যাওয়ার ঘটনা সত্যিই বিরল। তদুপরি, কেমোথেরাপিও এক্ষেত্রে তেমন কোনো কাজে আসেনি। সর্বশেষ চিকিৎসা হলো—আক্রান্ত অংশগুলো অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করে ফেলা।

এই সমস্ত কারণে, এই ভয়াবহ রোগের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এবং সম্ভাব্য বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাতে, সব ধরনের ব্যবস্থা ও সতর্কতা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা এটা হতে পারে, এ সমস্ত জীবাণু যাতে কুকুরের মধ্যেই সীমিত থাকে, সেখান থেকে ছড়াতে না পারে। যেহেতু কুকুর পালন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়; তাই আমাদেরকেই আমাদের জীবন রক্ষার্থে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, সতর্কতার সঙ্গে কুকুর পালতে হবে, কুকুরকে চুমু দেওয়া ও কুকুরের সংস্পর্শে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বাচ্চারাও যাতে কুকুর থেকে দূরে থাকে, সেই শিক্ষা তাদেরকে দিতে হবে। তাদের হাত-পায়ে যেন

কোনোভাবে কুকুরের লালা না লাগে, বাচ্চাদের খেলাধুলার জায়গা, পার্ক ইত্যাদি কুকুরমুক্ত রাখতে হবে।

আফসোসের বিষয় হলো—শিশু পার্ক এবং খেলাধুলার স্থানেই অধিক পরিমাণে কুকুর দেখা যায়। এছাড়া সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও কুকুর পৌঁছে গিয়েছে। কুকুরের খাবারের জন্য বিশেষ পাত্র প্রস্তুত রাখা দরকার, যাতে তারা মানুষের ব্যবহৃত খাদ্য-পাত্রে মুখ না দিতে পারে। খাবারের দোকান, বাজার এবং হোটেল ইত্যাদিতে যেন কুকুর প্রবেশ করতে না পারে। এককথায় কুকুরের ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে সতর্ক থাকা উচিত, তারা যেন খাবার ও পানীয়ের সংস্পর্শে কোনোভাবে আসতে না পারে।'[১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের সাথে ওঠা-বসা, খাদ্য-পাত্রে কুকুরের মুখ দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালতে নিষেধ করেছেন। আরবের নিরক্ষর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও উপদেশের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্র কীভাবে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে চিন্তা করেছেন কখনো? আমাদের পক্ষে তার সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বলা সম্ভব, যেটা কুরআনুল কারিম বলেছে—

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝٤

আর তিনি কোনো মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো কেবল ওহি, যা (তার প্রতি) প্রত্যাদেশ করা হয়।[২]

উপার্জন ও পেশা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝١٥

[১] জেরার্ড ফাইনস্টিমারের লেখা, জার্মানের কসিনস পত্রিকাতে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়।

[২] সুরা নাজম, আয়াত : ৩-৪

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনে হালাল-হারাম

জৈবিক চাহিদা

আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দুনিয়া আবাদের জন্যই মূলত মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যদি বেঁচেই না থাকে, তাহলে সেই উদ্দেশ্য সফলতার মুখ দেখবে কীভাবে? এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ নির্বিঘ্ন রাখা অপরিহার্য। তারা যেন চাষবাস, কাজকর্ম চলমান রাখে, জমি আবাদ, ঘরবাড়ি নির্মাণ, আল্লাহর হক আদায় ইত্যাদিতে রত থাকে। সবকিছু সুচারুরূপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে কিছু মৌলিক স্বভাব ও চাহিদা দিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে মানুষ নিজেকে যেমন বাঁচিয়ে রাখবে, তেমনি মনুষ্যজাতিও যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। খাদ্যের চাহিদা ঠিক এমন একটি মানবিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই মানুষ মূলত জীবিত থাকে।

মানুষের যৌনচাহিদা এমনই আরেকটি চাহিদার নাম। এটি পূরণের মধ্য দিয়ে মনুষ্যজাতি তার বংশক্রম ও ধারাবাহিকতা পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্নভাবে জারি রাখে। তবে এই চাহিদাটি মানুষের মধ্যে কখনো কখনো অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তখন মানুষমাত্রই এই চাহিদাটি পূরণের জন্য সুযোগ ও স্থান খুঁজে বেড়ায়। কথা হলো, মানুষের এই চাহিদার নিবৃত্তি কীভাবে ঘটবে?

এখানে আমাদের সামনে তিনটি সুযোগ রয়েছে—

[এক] মানুষকে পূর্ণ লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া। নৈতিক, চারিত্রিক বা ধর্মীয় কোনো ধরনের বাধা-নিষেধ ও সীমায় তাকে না বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা তার চাহিদাটি ও মনোবাসনা পূরণের সুযোগ প্রদান। যেমনটা ধর্মে ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাসী অসীম বৈধতার পক্ষশক্তি বলে থাকে। এমন সুযোগ দিলে মানুষ ধীরে ধীরে পশুতে পরিণত হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজসহ সর্বস্তরে সে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

[দুই] এই চাহিদাকে সর্বাত্মকভাবে বাগে আনা এবং সমূলে নিশ্চিহ্নকরণ। যাতে এটি কখনোই মাথাচাড়া দিতে না পারে। যেমনটা সন্ন্যাসী ও বৈরাগ্যবাদীরা করে থাকে। এতে মানুষের একটি স্বভাবজাত চাহিদাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়। এ তো স্রষ্টাপ্রদত্ত একটি মানবিক জন্মগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মহা-অবিচার। আল্লাহ তাআলা মানুষের বংশক্রম ও ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য তার মধ্যে যে স্বয়ংক্রিয় নিয়ম-নীতি প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এই নিয়ম কখনোই যায় না।

[তিন] চাহিদাটি নিবৃত্তির জন্য লাগামহীনভাবে ছেড়ে না দিয়ে কিংবা একে সমূলে উপড়ে না ফেলে তার জন্য নির্দিষ্ট একটা সীমা বেঁধে দেওয়া। বিভিন্ন আসমানি ধর্মে এই সীমাকেই 'বিয়ে' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সবগুলো আসমানি ধর্মেই বিয়ের বৈধতা আর ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামের বৈশিষ্ট্যই হলো মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার স্বীকৃতি প্রদান, তাই এখানে বিয়ে অত্যন্ত সহজ একটি বিধান। অন্যদিকে সন্ন্যাসবাদ ও নারীসঙ্গ বর্জন এখানে নিষিদ্ধ। পাশাপাশি ব্যভিচার ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়াদিতে আরোপিত হয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারি ও নিষেধাজ্ঞা।

মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত এটিই। বিয়ের মাধ্যমে যৌনচাহিদা পূরণের অনুমতি না দিলে মানুষের বংশানুক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। অন্যদিকে সমাজে ব্যভিচার চালু থাকলে পারিবারিক ভালোবাসা, আদর, স্নেহ ও ত্যাগের অনুভূতিগুলো গড়ে ওঠে না। একটি পরিবার গঠিত হয় মূলত এসব অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই। সেই পরিবারের হাত ধরেই আবার গড়ে ওঠে সমাজ। পরিবারই যদি না থাকে, তাহলে সমাজ আসবে কোত্থেকে? আর সমাজবদ্ধ হওয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে উন্নতি ও অগ্রগতি করা অসম্ভব।

ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না

যিনার নিষিদ্ধতা ও বিরোধিতায় সকল ঐশী ধর্মই বদ্ধপরিকর। ইসলাম সেই ধারার সর্বশেষ ধর্ম। ব্যভিচারের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। মূলত এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে জন্ম, বংশ-প্রক্রিয়া, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা সবকিছুর অর্গল ও শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা ছড়াবে লাগামহীনভাবে। চারদিকে বিস্তার লাভ করবে যৌনবাহিত রোগ ও চরম চারিত্রিক অবক্ষয়।

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন—

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং জঘন্য পথ।[১]

কোনো কিছু হারামের অর্থই হলো, তার সঙ্গে জড়িত যাবতীয় উপায়-উপকরণও নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রকাশ্য যৌন-উত্তেজক, নারী-পুরুষকে ফিতনা ও অশ্লীলতার প্রতি আহ্বায়ক, তাদের কাছে নির্লজ্জতার প্রচারক ও নীতি-নৈতিকতার বাঁধ ভেঙে ফেলতে সহযোগী সকল কিছুই ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ।

গায়রে মাহরাম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান

ব্যভিচার রোধে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্যতম হচ্ছে—গায়রে মাহরাম নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ একান্তে থাকতে পারবে না। স্ত্রী এবং যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম (যেমন : মা, বোন, ফুফু, খালা প্রমুখ) তারা ছাড়া বাকি সব নারী একজন পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম হিসেবে বিবেচিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

নারী-পুরুষের প্রতি অনাস্থা থেকে এই বিধিনিষেধ তৈরি হয়নি। একজন পুরুষ ও নারী যখন একান্তে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় থাকে, তাদের মধ্যে তৃতীয় কেউ না থাকে,

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩২

তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার ফলে তাদের ভেতরকার আদি পুরুষত্ব ও নারীত্ব জাগ্রত হতেই পারে। এই সম্ভাব্য ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষার জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

> আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন কোনো (গায়রে মাহরাম) নারীর সঙ্গে একান্ত নির্জনে না থাকে, যার সাথে তার মাহরাম পুরুষ নেই। কারণ, (এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য) শয়তান তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকে।[১]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

> কোনো পুরুষ যেন কোনো (গায়রে মাহরাম) নারীর সাথে তার মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া একান্তে অবস্থান না করে।[২]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴿٥٣﴾

> *আর যখন নবি-পত্নীদের কাছে তোমরা কোনো সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।*[৩]

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬৫১; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৯১, হাদিস : ১১৪৬২; হাদিসটি হাসান।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫২৩৩, *সহিহ মুসলিম* : ১৩৪১

[৩] সুরা আহযাব, আয়াত : ৫৩

'তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র'—এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'স্বভাবত পুরুষের মনে নারী সম্পর্কে এবং নারীর মনে পুরুষ নিয়ে যেসব চিন্তার উদয় ঘটে, সেগুলোও যাতে কারো মনে উদয় না হয়, উভয়েই ঝুঁকিমুক্ত থাকে এবং তাদের ব্যাপারে অন্যদের মনেও সংশয় জাগ্রত না হয়; এজন্য এভাবে (পর্দার আড়াল থেকে) প্রয়োজনীয় জিনিস চাইতে বলা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা গেল, কারো জন্যই নিজের ওপর আস্থার কারণে গায়রে মাহরামের সঙ্গে একান্তে থাকা উচিত হবে না। কেননা এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ এড়িয়ে চলাই হলো সবার জন্য নিরাপদ ও কল্যাণকর এবং চারিত্রিক পবিত্রতার পক্ষে অধিক সহায়ক।'[১]

এজন্য আপন দেবর, চাচাতো দেবরদের সঙ্গে নারীদের একান্তে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। যেহেতু আত্মীয়দের মধ্যে সাধারণত পর্দার ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা থাকে, এই সুযোগে যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা, খুলে যেতে পারে জঘন্য সব গুনাহের দুয়ার। তাই আত্মীয়দের সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর বিষয়ে আরো বেশি সতর্ক থাকা দরকার। আত্মীয়দের মধ্যেই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি। কারণ, আত্মীয় হওয়ার সুবাদে তারা যতটা নারীর কাছে যেতে পারে, একজন অপরিচিত মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না।

একই বিধান নারীর গায়রে মাহরাম পুরুষ আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন : নারীর চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই। এদের সঙ্গেও একান্তে ঘনিষ্ঠ অবস্থান ইসলামে অনুমোদিত নয়।

উকবা ইবনু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ

> তোমরা (গায়রে মাহরাম) নারীদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। তখন এক আনসারি সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, 'হামবু' (স্বামীর

[১] *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২২৮

> নিকটাত্মীয়)-এর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'হামবু' হলো মৃত্যু।[১]

'হামবু' অর্থ—স্বামীর নিকটাত্মীয়।[২]

'হামবু' হলো মৃত্যু'—এই বক্তব্যের দ্বারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, এদের সঙ্গে নির্জনে একান্তে মিলিত হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ধ্বংসের কারণ। কেননা, নারী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তো তার পরকাল ধ্বংস হলো, আর অন্যদিকে স্বামী যদি (এসব ঘটনায় সন্দেহ করে বা নিশ্চিত হয়ে) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে এর পাশাপাশি তার দুনিয়াও গেল। তাছাড়া এ ধরনের নানা অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে আত্মীয়দের মধ্যকার সম্পর্কেও ধস নামতে বাধ্য।

এসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার রেশ কেবল আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা বিচ্ছেদের মধ্যেই সীমিত থাকে না; বরং এটি পরিবার ও স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে বিশাল হুমকির মুখে ফেলে দেয়। নিন্দুক ও ছিদ্রানুসন্ধানীরা এদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, আর নানান জিনিস রটাতে থাকে। আর এতে স্বাভাবিকভাবেই একসময় তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

ইমাম ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আরবি ভাষাভাষীরা 'সিংহ হলো মৃত্যু' এবং 'শাসক হলো আগুন'—এ জাতীয় কথা অনেক বেশি বলে। এটার অর্থ সিংহ ও শাসকের সাক্ষাৎ মৃত্যু-সমতুল্য। 'হামবু হলো মৃত্যু' কথাটিও এমনই একটি কথা। এর অর্থ—অপরিচিত মানুষের সঙ্গে নির্জনে সময় কাটানোর চেয়ে হামবু তথা স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে নির্জনে সময় কাটানো অধিক ভয়ানক, প্রায় মৃত্যু সমতুল্য। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যেমন হতে পারে সেই 'হামবু' স্ত্রীকে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫২৩২, *সহিহ মুসলিম* : ২১৭২

[২] এখানে الحمو বলতে স্বামীর নিকটাত্মীয় বোঝানো হয়েছে। তবে স্বামীর পিতা-দাদা বা তার উর্ধ্বতন পুরুষ এবং তার (ঔরসজাত অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) সন্তান-নাতী বা তার অধস্তন পুরুষ উদ্দেশ্য নয়; কেননা এরা হলো তার স্ত্রীর জন্য মাহরাম, তাদের সাথে তার স্ত্রীর একান্তে অবস্থান করা বৈধ। অতএব তারা তার জন্য মৃত্যুতুল্য নয়। এখানে স্বামীর নিকটাত্মীয় হচ্ছে, হলো—স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচা, চাচাতো ভাই প্রমুখ, যারা তার স্ত্রীর জন্য মাহরাম নয়। মানুষ সাধারণত এদের ব্যাপারে (দেখা-সাক্ষাৎ, চলাফেরায়) শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং নিজের ভাবির সাথে একান্তে অবস্থান করে। সুতরাং এটাই হলো তাদের জন্য মৃত্যু সমতুল্য। আর এটার কারণেই অনাত্মীয়দের চেয়ে এসব দেবর, চাচা, চাচাতো ভাইয়েরাই নিষেধাজ্ঞার অধিক উপযুক্ত। [*আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫৪]

স্বামীর কাছে তার সাধ্যাতীত কোনো কিছু চাইতে উস্কে দিলো কিংবা তাকে স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে প্ররোচনা জোগালো ইত্যাদি।'[১]

বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি কামনাপূর্ণ দৃষ্টি

জৈবিক চাহিদা ও যৌনতাকে নিয়ন্ত্রিত পন্থায় পূরণের ধারাবাহিকতায় আরেকটি বিষয় নিষিদ্ধ হয়েছে—বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামভাব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাকানো। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ চোখ হলো অন্তরের দরজা। তাই (বেগানা নারীর দিকে) দৃষ্টিপাত ব্যভিচারের বার্তাবাহক ও যাবতীয় ফিতনার সূচনাদ্বার।

প্রাচীন এক কবি বলেছেন—

كُلُّ الحَوَادِثِ مَبدَاهَا مِنَ النَّظرِ وَ مُعظَمُ النَّارِ مِنْ مُستَصْغَرِ الشَّرَرِ

চোখের দৃষ্টি থেকেই সকল বিপদ শুরু,
ছোট্ট স্ফুলিঙ্গা থেকে জন্মায় বিশাল অগ্নিকাণ্ড।

আরেক কবি বলেন—

نَظْرَةٌ فَابْتِسامَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

চোখাচোখি, মুচকি হাসি, এরপর সালাম-কালাম, প্রতিশ্রুতি। তারপর সাক্ষাৎ।

তাই কুরআনে মুমিন নারী-পুরুষ সবার উদ্দেশে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ লজ্জাস্থান হিফাযতের আদেশের সঙ্গেই আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

[১] *জামিউল উসুল*, ইবনুল আসির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৫৬

بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ সংরক্ষিত রাখে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নিজেদের (ধর্মের মুসলিম) নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনাহীন পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য জোরে পদচারণা না করে।[১]

এই আয়াতে আল্লাহ-প্রদত্ত অনেক নির্দেশনা রয়েছে, তন্মধ্যে দুটি নির্দেশনা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। যথা : দৃষ্টি অবনত রাখা ও যৌনাঙ্গের হিফাযত। আর অবশিষ্টগুলো বিশেষভাবে নারীর জন্য।

লক্ষণীয় বিষয় যে, দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশের ভাষ্য হলো—يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ অর্থাৎ দৃষ্টির পুরোটাই নত রাখতে হবে না; বরং আংশিক নত রাখলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু লজ্জাস্থান সংযত করার নির্দেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে-وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ অর্থাৎ লজ্জাস্থান পুরোটাই হিফাযত করতে হবে, সেখানে বিন্দুমাত্র ছাড় নেই। অন্যদিকে দৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সামান্য ছাড় দিয়েছেন, অন্যথায় মানুষের জন্য চলাফেরা করা কষ্টকর হয়ে যেতো।

দৃষ্টি নত রাখার অর্থ, চোখ বন্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা নয়। এটা কুরআনের উদ্দেশ্যও নয় আর তা পালন করা সম্ভবও নয়। কেননা, আমরা দেখি সুরা লুকমানে উল্লেখিত হয়েছে—

---

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩০-৩১

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴿١٩﴾

আর তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখো।[১]

এখানে কণ্ঠস্বর নিচু রাখার অর্থ ঠোঁট সেলাই করে একেবারে মুখ বন্ধ রাখা নয়। অনুরূপ দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো যথাসম্ভব নিম্নগামী রাখা, একেবারে লাগামহীন ছেড়ে না দেওয়া। সামনে যত সুন্দর নারী-পুরুষ পড়ে, সবার দিকে হা করে তাকিয়ে না থাকা। বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি দৃষ্টি পড়লে তার সৌন্দর্য গিলে গিলে খাওয়া বা তাকে মন ভরে দেখা যাবে না; বরং চোখ পড়ামাত্রই তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রাযিয়াল্লাহুকে বলেছেন—

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

> হে আলি, (কোনো নারীর দিকে) একবার দৃষ্টি দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, তোমার জন্য (আকস্মিক হওয়ায়) প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখার বৈধতা নেই।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ক্ষুধিত ও লোলুপ দৃষ্টি দেওয়া যিনা বলে অভিহিত করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ

> চোখও যিনায় লিপ্ত হয়, চোখের যিনা হলো অন্যায়ভাবে দৃষ্টিপাত। [৩]

অবৈধ দৃষ্টিকে যিনা বলার কারণ হলো, বিপরীত লিঙ্গের কারো দিকে লালসাপূর্ণ

---

[১] সুরা লুকমান, আয়াত : ১৯

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৪৯; *জামিউত তিরমিযি* : ২৭৭৭; হাদিসটি হাসান।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬২৪৩, *সহিহ মুসলিম* : ২৬৫৭

দৃষ্টিতে তাকানোও জৈবিক চাহিদা পূরণের একটি অবৈধ মাধ্যম। কারণ এতেও মানুষ তৃপ্তি লাভ করে, জৈবিক আনন্দ পায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের মতো ইঞ্জিলেও ঈসা আলাইহিস সালামের এমন একটি বক্তব্য এসেছে। তিনি বলেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকেরা বলত, তোমরা যিনা কোরো না। আমি তোমাদের বলছি, যে লোলুপ চোখ দিয়ে দেখল, সেও (একপ্রকার) যিনা করল।'[১]

লালসাপূর্ণ ও ক্ষুধিত দৃষ্টিতে বিপরীত লিঙ্গের দিকে নজর দেওয়ার প্রতিক্রিয়া অনেক বিশাল ও বিস্তৃত। এর প্রভাব সাধারণত চারিত্রিক পবিত্রতার সীমা ছাড়িয়ে মানসিক স্থিতিশীলতা, অন্তরের প্রশান্তি সবকিছুর ওপর পড়ে। এর ফলে অনেক সময় ব্যক্তি নানা দুর্ঘটনা ও বিচ্যুতির শিকার হয়।

কবি বলেন—

وَكُنتَ مَتَى أَرْسَلتَ طَرفَكَ رَائِدًا
لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِر
رَأَيْتَ الذِي لَا كُلُّهُ أنتَ قَادِر
عَلَيهِ وَلَا عَن بَعْضِهِ أَنتَ صَابِر

আর তুমি যখন অন্তরের অগ্রদূত হিসেবে তোমার দৃষ্টিকে দিয়েছ ছেড়ে,
তখন মনে রেখো, একদিন সকল দৃশ্য-রূপ তোমাকে তুলবে ক্লান্ত করে;
তুমি (দুচোখ ভরে সৌন্দর্যের) যা কিছু দেখেছ, না সক্ষম তার সব পেতে,
আবার (স্বচক্ষে সবকিছু দেখার পর) কিছু ব্যাপারে না পারছ ধৈর্য ধরতে।

সবার জন্য উন্মুক্ত গোসলখানায় নারীদের প্রবেশ

পর্দা প্রসঙ্গে সর্তকতা অবলম্বনের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত গোসলখানায় নারীদের গোসলের জন্য প্রবেশ নিষেধ করেছেন। এসব

[১] *মথির ইনজিল*, ৫ : ২৮, ২৯

গোসলখানায় নারীরা একত্রে অন্যান্য নারীর সামনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করত। সাধারণত সব জায়গাতেই এমন কিছু নারী থাকে, যারা অন্য নারীদের শারীরিক গঠন, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মজলিস মাতিয়ে রাখে এবং বিভিন্ন কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রচার করতে উস্তাদ। এসব উন্মুক্ত গোসলখানায় যেহেতু পর্দা লঙ্ঘন হয়, তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এসব গোসলখানায় নারীদের প্রবেশ নিষেধ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি ইত্যাদি ছাড়া সতর অনাবৃত অবস্থায় পুরুষদেরকেও এসব গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ

> আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন ইযার (লুঙ্গি-পায়জামা) পরা ছাড়া (পুরুষদের সবার জন্য উন্মুক্ত) গোসলখানায় প্রবেশ না করে। আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে (সবার জন্য উন্মুক্ত) গোসলখানায় প্রবেশ না করায়।[১]

তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে, যেমন : কোনো রোগ বা সন্তান জন্মের পরে যদি কোনো নারীকে এসব গোসলখানায় নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাম্মাম বা উন্মুক্ত গোসলখানার ব্যাপারে বলেছেন—

إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ.

> শীঘ্রই তোমাদের হাতে অনারবদের বহু অঞ্চল বিজিত হবে এবং সেখানে তোমরা এমন কতগুলো ঘর দেখতে পাবে, যেগুলোকে হাম্মাম (গণ-গোসলখানা) বলা

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ২৮০১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬৫১; হাদিসটি হাসান।

> হয়। ইযার (লুঙ্গি-পায়জামা) ছাড়া কোনো পুরুষ যেন তাতে প্রবেশ না করে। আর তোমরা নারীদেরকেও তাতে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করো, অসুস্থ ও প্রসূতি হলে ভিন্ন কথা।[১]

এই হাদীসের সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তবে অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলামে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ছাড়ের মনোভাব এই হাদিসের বিষয়কে সমর্থন করে। তেমনিভাবে একটি প্রসিদ্ধ ফিকহি মূলনীতি হলো—মন্দের দরজা বন্ধের উদ্দেশ্যে শরিয়তে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রয়োজন এবং কল্যাণের খাতিরে বৈধ হতে পারে। ফিকহের এ মূলনীতিটিও এই হাদিসের বক্তব্যকে শক্তি যোগায়। অনুরূপ *মুস্তাদরাকুল হাকিমে* বর্ণিত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসও একে সমর্থন করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اتَّقُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّرَنَ وَيَنْفَعُ الْمَرِيضَ ، قَالَ : فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ

> হাম্মাম (গণ-গোসলখানা) নামক ঘর থেকে তোমরা দূরে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তা (শরীরের) ময়লা দূর করে এবং অসুস্থ রোগীর উপকারে আসে। তিনি বললেন, তাহলে যে তাতে প্রবেশ করবে, সে যেন সতর আবৃত রাখে।[২]

সুতরাং বিনা প্রয়োজনে যে নারী উন্মুক্ত গোসলখানায় যাবে, সে হারামে লিপ্ত হবে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরস্কারের উপযুক্ত হবে। আবুল মালিহ আল-হুযালি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০১১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৭৪৮; হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭৭৭৮; *শুআবুল ঈমান* : ৭৩৭৫; হাদিসটি সহিহ।

> একবার সিরিয়ার কিছু মহিলা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত সেই শহরের অধিবাসী, যেখানে মহিলারা হাম্মাম তথা গণ-গোসলখানায় প্রবেশ করে। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মহিলা নিজের ঘর ছাড়া অন্যত্র তার পরিধেয় বস্ত্র খুললে সে নিঃসন্দেহে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ছিড়ে ফেলল (অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করল)।[১]

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا ، خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرًا

> যে নারী তার নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, তার থেকে আল্লাহ তাঁর পর্দা সরিয়ে নেন।[২]

হাম্মাম বা গণ-গোসলখানা হলো, চার দেওয়ালবিশিষ্ট একটি ঘর, যেখানে কেবল নারীরা প্রবেশ করে। চারপাশে দেওয়াল থাকা সত্ত্বেও এখানে নারীদের প্রবেশের বিষয়ে এতটা কঠোরতা আরোপিত হয়েছে। তাহলে যে সব নারীরা বিভিন্ন সমুদ্র তীরে প্রায় বিবস্ত্র হয়ে দৈহিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী হতে পারে?

এরা তো তাদের জন্য রবের 'নিরাপত্তার পর্দা' ছিঁড়েই ফেলেছে। গুনাহের ক্ষেত্রে এদের পুরুষ অভিভাবকরাও এদের সম-অংশীদার। কারণ, অভিভাবকরা এসব নারীদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। হায় যদি তারা বুঝতো!

নারীদের সৌন্দর্য-প্রদর্শন হারাম

কাফির এবং জাহিলি নারীদের চেয়ে একজন মুসলিম নারীর স্বাতন্ত্র্য হলো—তার চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জা ও চারিত্রিক সংকোচন। অন্যদিকে একজন জাহিলি নারীর

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০১০; *জামিউত তিরমিযি* : ২৮০৩; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৫৬৯; *শুআবুল ঈমান* : ৭৩৮৪; হাদিসটি হাসান।

বৈশিষ্ট্য হলো—সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষদের প্রলুব্ধকরণ।

তাবাররুজ (সৌন্দর্য প্রদর্শন)

তাবাররুজ (تبرّج) অর্থ—উন্মোচন ও চোখের সামনে প্রকাশ পাওয়া, যা برج শব্দমূল থেকে নির্গত। এ কারণেই আরবিতে সুউচ্চ দুর্গ ও আকাশের নক্ষত্রকে বুরুজ (برج) বলা হয়। যেহেতু এগুলো উঁচু ও প্রকাশ্য হওয়ার ফলে মানুষের দৃষ্টিতে আসে। বিখ্যাত ভাষাবিদ ও মুফাসসির ইমাম যমাখশারি তাবাররুজ (تبرّج) শব্দটির বাস্তবতা উল্লেখ করে বলেন—

تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم: سفينة بارج ، لا غطاء عليها....إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها.

'তাবাররুজ (تبرّج) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো—যা গোপন করা অপরিহার্য ছিল তা জোরপূর্বক প্রকাশ করা। যেমন : (আরবি ভাষায়) বলা হয়, سفينة بارج অর্থাৎ এমন জাহাজ, যার কোনো পাল নেই। (জাহাজকে পাল দিয়ে আবৃত রাখার নিয়ম থাকলেও জোর করে পাল খুলে ফেলা হয়েছে; বিধায় এটাকে سفينة بارج বা খোলামেলা উন্মুক্ত জাহাজ বলা হয়।) ...পরে অবশ্য তাবাররুজ (تبرّج) শব্দটি বিশেষভাবে শুধু পুরুষের সামনে নারীর সৌন্দর্য-শোভা ও রূপ প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।'[১]

ইমাম যমাখশারির ব্যাখ্যা থেকে আমরা অতিরিক্ত একটি উপাদান—জোরপূর্বক প্রদর্শনীর অর্থ পেলাম। আর নারীদের এই রূপ-লাবণ্য প্রকাশের বিষয়টি কখনো দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শনের দ্বারা যেমন হতে পারে, তেমনি আবার কখনো বাচনভঙ্গি, হাঁটার ধরন বা অলংকার, কাপড়-চোপড় ও প্রসাধনী প্রকাশের মাধ্যমেও হতে পারে।

অতীতে নারীদেহের সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শনীর বিভিন্ন ধরন ও উপায় যেমন ছিল, বর্তমান সময়েও সেগুলো রয়েছে। মুফাসসিরগণ এর কিছু কিছু চিত্র সুরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতের অধীনে আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত তাবিয়ি মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাবাররুজ (تبرّج) অর্থ—পুরুষের মধ্য দিয়ে গটগট করে হেঁটে বেড়ানো। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাবাররুজ (تبرّج) অর্থ—হেলেদুলে ও

[১] *আল-কাশশাফ*, যামাখশারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫৫

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে হাঁটা। মুকাতিল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তাবাররুজ (تبرّج) এর উদ্দেশ্য হলো, জাহিলি-যুগে নারীরা মাথায় ওড়না দিত, কিন্তু সেটি বেঁধে রাখত না, ফলে তার সাজসজ্জা—অলংকার ও দেহ—কাঁধ, গলা সবই দেখা যেত।

পুরুষের সঙ্গে ওঠাবসা, কোমর দুলিয়ে হাঁটা, ওড়না পরে শারীরিক সৌন্দর্য প্রদর্শন—এগুলো ছিল প্রাচীন জাহিলি দেহ-প্রদর্শনীর অংশ। তবে বর্তমান সময়ের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন দেহ-প্রদর্শন প্রতিযোগিতার নানা উদ্ভট ধরন ও প্রকারের সামনে প্রাক-ইসলামি যুগের অসভ্যতা ও বর্বরতা অনেকটা ভদ্রতার মধ্যেই পড়ে যাবে হয়তো।

নারীদের পর্দানশিন হওয়ার উপায়

ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলো—

ক. দৃষ্টি সংযত রাখা। নারীদের সবচেয়ে মূল্যবান সৌন্দর্য হলো লজ্জা। আর লজ্জার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো আনত দৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

আর আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।[১]

খ. পুরুষদের মিশ্রণ থেকে দূরে থাকা। সম্মেলনের হল, ইউনিভার্সিটির সিঁড়ি, সেমিনার রুম, জনবহুল যানবাহনে পুরুষের ঠেলাঠেলি ও স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। মাকিল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

> গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুঁচ বিদ্ধ হওয়া অধিক উত্তম।[২]

---

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩১

[২] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২১১-২১২, হাদিস : ৪৮৬, ৪৮৭; *মুসনাদুর*

দাম্পত্য সম্পর্ক

কুরআনুল কারিমে বৈবাহিক সম্পর্কের মানসিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটাই দাম্পত্যজীবনের মূলভিত্তি। মানুষের জৈবিক চাহিদাগত অস্থিতিশীলতা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসার মাধ্যমে দূর হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের হাত ধরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা ও মুহাব্বাতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি বাবা-মার ভালোবাসা, আদর ও স্নেহের বিকাশ এবং পূর্ণতা সাধিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

তার নিদর্শনসমূহের একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।[১]

স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক

ইসলামে বিয়ের মানসিক উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে শারীরিক দিকও উপেক্ষিত হয়নি। এখানে স্বাভাবিক সময়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং রজঃস্রাবের সময় বিরত থাকার জন্যও সর্বোত্তম পন্থা নির্দেশিত হয়েছে।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ইহুদি ও অগ্নিপূজকেরা রজঃস্রাবকালীন স্ত্রীদের থেকে দূরত্ব বজায়ে অনেক বাড়াবাড়ি করত। তারা এ সময়ে স্ত্রীদের সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় থাকত না; এমনকি একসাথে বসে পানাহারও করত না। এর বিপরীতে খ্রিষ্টানরা দেখাত অতিরিক্ত শিথিলতা। তারা রজঃস্রাবের সময়েও স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতো, এ ব্যাপারটিকে তারা কিছুই মনে করত না। আর জাহিলি যুগের আরবরা ছিল ইহুদি ও অগ্নিপূজকদের মতো। তারাও স্ত্রীদের সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় থাকত না এবং একসাথে বসে পানাহার করত না।

[১] সুরা রুম, আয়াত : ২১

এজন্যই মুমিনগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রজঃস্রাবকালীন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়িয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অশুচি। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীদের (সহবাস) থেকে দূরে থাকো এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট (সহবাসের জন্য) ঠিক সেভাবে গমন করো, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।[১]

কিছু গ্রাম্য লোক স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকা বলতে বুঝেছিল, স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে বসবাস করা যাবে না। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যেমন আনাস রাযিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ

ইহুদিরা তাদের কারো স্ত্রীর হায়িয (ঋতুস্রাব) হলে তার সাথে একসঙ্গে খাবার খেতে না এবং একঘরে বসবাসও করত না। সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২

> তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন—'আর তারা আপনাকে রজঃস্রাব (হায়িয) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অশুচি। কাজেই তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীদের (সহবাস) থেকে দূরে থাকো...।'[১] এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা (স্ত্রীদের ঋতুস্রাবের সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই করতে পারবে। এ খবর ইহুদিদের কাছে পৌঁছলে তারা বলতে লাগল, এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়।[২]

অতএব, সহবাস ছাড়া অন্যভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে আনন্দ নিতে কোনো বাধা নেই। মাসিকের সময় স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে দেওয়াটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি; যেমনটি ইহুদিরা করত, অন্যদিকে সহবাসে লিপ্ত হওয়াটা অতিরিক্ত ছাড়াছাড়ি; যেমনটি খ্রিস্টানরা করত। ইসলামের শিক্ষা হলো মধ্যমপন্থা অবলম্বন। আর সেটা হলো, রজঃস্রাবকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া বাকি সবকিছু স্বাভাবিকভাবে করা।

সম্প্রতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে আমরা জেনেছি, রজঃস্রাবের রক্তে একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে, এটি নিঃসৃত না হলে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে, রজঃস্রাবের সময় সহবাস এড়ানোর হেতুও আবিষ্কৃত হয়েছে। এসময় অভ্যন্তরীণ গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণের কারণে প্রজনন অঙ্গাগুলো সংকুচিত ও স্নায়ু অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ফলে এ সময় সহবাস করলে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কখনো কখনো মাসিক বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি যৌন অঙ্গাগুলোতেও প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে।[৩]

সহবাসে মলদ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ

স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৩০২; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৮

[৩] *আল-ইসলাম ওয়াত-তিব্বুল হাদিস* (الإسلام والطب الحديث) বা ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, আব্দুল আযিয ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ।

مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে (অর্থাৎ স্ত্রীর যোনিপথে সামনের দিক থেকে বা পেছনের দিক থেকে, ডানের দিক থেকে বা বামের দিক থেকে—যেদিক থেকেই) ইচ্ছে গমন করতে পারো। আর তোমরা নিজেদের কল্যাণে কিছু (উত্তম আমল) অগ্রে প্রেরণ করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, তোমরা অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখীন হবে। আর (হে নবি,) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।[১]

এই আয়াতটি অবতীর্ণের পেছনে একটি প্রেক্ষাপট ও কারণ আছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ রচিত *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* গ্রন্থে আলোচনাটি সুন্দরভাবে এসেছে। তিনি বলেন, 'কোনো ঐশী নির্দেশ ছাড়াই অযৌক্তিকভাবে যৌনমিলনের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু বিধিনিষেধ তৈরি করে রেখেছিল ইহুদিরা। আনসার এবং অন্যরা তাদের সেসব মত অনুসরণ করে বলত, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর পেছন দিক থেকে যোনিপথে সহবাস করে, তাহলে সেখান থেকে জন্ম নেওয়া শিশুটির চোখ বাঁকা হবে। তাদের এই অহেতুক বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের জন্য অবতীর্ণ হয়—'অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পারো।'[২] অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীর পেছনের দিকে থাকো বা সামনের দিকে, সেটা বিবেচ্য নয়, শর্ত হলো সংগম হতে হবে যোনিপথ দিয়ে। এর সঙ্গে ধর্মীয় বা সামাজিক বিধিনিষেধের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির বিষয়। এই ধরনের বক্তব্য ছিল ইহুদিদের অযৌক্তিক চিন্তাভাবনার অংশ, তাই ইসলামের মাধ্যমে এ ধরনের চিন্তা সমূলে উৎখাত করাটাই ছিল যৌক্তিক ও যথাযথ।'[৩]

সহবাসের পদ্ধতি বা পন্থা নির্ধারণ দ্বীনের কাজ নয়। দ্বীনের কাজ হলো স্বামী যেন আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি হওয়ার কথা মনে রাখে, তাহলে সে নিষিদ্ধ উপায়ে

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[৩] *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০৭

মলদ্বার দিয়ে যৌনানন্দ লাভ থেকে এমনিতেই বিরত থাকবে। কারণ, সেটা স্ত্রীর জন্য কষ্টকর ও নোংরা জায়গা। তদুপরি এটা সমকামিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই দ্বীনের দাবি হলো—এমন কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

তোমরা স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়ে সহবাস কোরো না।[১]

আরেক স্থানে তিনি বলেন—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى

> যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে, তার এ কুকর্মের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা হলো ছোট সমকামিতা।[২]

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً ، فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: ' {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا

> এক মহিলা তাকে (উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে) ওই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, যে স্ত্রীর পেছন দিক থেকে তার যোনিতে সহবাস করে। অতঃপর উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন—'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৮৫৮; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪১৯৮; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৯৬৭; *শারহু মাআনিল আসার* : ৪৪২৫; হাদিসটি হাসান।

ইচ্ছে গমন করো।'[১] তিনি বলেন, (সহবাস) একই রাস্তায় (অর্থাৎ যোনিপথে) হতে হবে।[২]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, কীসে তোমাকে ধ্বংস করল? উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাতে আমি আমার বাহনকে উল্টো করে ব্যবহার করেছি (অর্থাৎ স্ত্রীর পেছনের দিক থেকে তার যোনিপথে সহবাস করেছি)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার কোনো জবাব দিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো—'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করো।'[৩] (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন,) সামনের দিক থেকে সহবাস করো এবং পেছনের দিক থেকে সহবাস করো, তবে স্ত্রীর মলদ্বার ও হায়িযের সময় (সহবাস) পরিহার করো।[৪]

স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা

আল্লাহ তাআলা পুণ্যবতী স্ত্রীদের প্রশংসা করে বলেন—

---

[১] সুরা বাকারা : ২২৩

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৬৪৩; *তাফসিরু আব্দির রাজ্জাক* : ২৬৫; হাদিসটি হাসান।

[৩]সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[৪] *জামিউত তিরমিযি* : ২৯৮০; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭০৩; হাদিসটি হাসান।

গর্ভপাত

প্রয়োজন সাপেক্ষে গর্ভধারণ রোধের জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামে অনুমোদিত। তবে গর্ভে বাচ্চা চলে আসার পরে তার ওপর অনাচারের কোনো অনুমোদন নেই, এমনকি এই সন্তান নিষিদ্ধ পন্থায় আসলেও। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ব্যভিচারিণীর গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম ও দুগ্ধপানের সময়সীমা পার হওয়ার পরেই তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করেছেন।[১]

গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পরে সেই সন্তান ফেলে দেওয়া সকল ফকিহের মতেই হারাম ও জঘন্য গুনাহের কাজ। কোনো মুসলিমের জন্য এ ধরনের জঘন্য কাজ বৈধ নয়। এটি একটি পূর্ণ জীবন্ত মানব সন্তানের প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার। এজন্যই কেউ যদি (লাথি, ঘুষি বা অন্য কোনো আঘাতের মাধ্যমে) এই ধরনের সন্তানের গর্ভপাত করায়, আর সন্তান জীবিত অবস্থায় বের হয়ে এসে পরে মারা যায়, তাহলে এটার কারণে তাকে রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি মৃতই ভূমিষ্ট হয়, তাহলে তার ওপর আর্থিক জরিমানার শাস্তি আরোপিত হবে, তবে সেটা রক্তপণের চেয়ে তুলামূলক কম। তবে (গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার পরে সেই সন্তান ফেলে দেওয়াকে নাজায়িয ও হারাম বলার পাশাপাশি) ফকিহগণ এটাও বলেছেন, যদি নির্ভরযোগ্য উপায়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হলে মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত; অর্থাৎ এখানে দুজনের একজন মারা যাবেই, সেক্ষেত্রে সন্তান রক্ষার জন্য মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না। সন্তানকে বাঁচানোর বিকল্প কোনো পদ্ধতি জানা না থাকলে তাকে ফেলে দিতে হবে। কারণ, মা হলো এই গর্ভস্থ সন্তানের মূল ও জন্মদাতা, তাই তার জীবনের নিশ্চয়তা আগে দিতে হবে। তাছাড়া তার সঙ্গে দুনিয়ার অনেকের অধিকার জড়িয়ে আছে, অন্য কোনো সন্তানসন্ততি থাকলে তাদের অধিকারও আছে। অন্যদিকে গর্ভস্থ সন্তানের জীবন অনেকটা অনিশ্চিত, দুনিয়াতে তার কোনো অধিকার এখনো সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং একটি অনিশ্চিত ও অধিকারবিহীন জীবনের জন্য একটি নিশ্চিত ও বহুজনের অধিকারে জড়িত একটি জীবনকে আমরা কুরবানি করতে পারি না।[২]

অনুরূপভাবে যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, গর্ভস্থ ভ্রূণটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে জন্মাবে,

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৯৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৪৪২

[২] *আল-ফাতাওয়া*, শাইখ শালতুত, পৃষ্ঠা : ২৮৯-২৯০

এই জীবন তার নিজের এবং চারপাশের মানুষের জন্য সীমাহীন কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাহলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে এই ভ্রূণ ফেলে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এটি গর্ভধারণের প্রথম চার মাসের মধ্যে করতে হবে (যখন ভ্রূণের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয় না), এর পরে করার অনুমতি নেই।

ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'গর্ভরোধ ও গর্ভপাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গর্ভরোধের বিষয়টি ভ্রূণ ও জীবন্ত সন্তান হত্যার মতো জঘন্য নয়। কারণ, গর্ভপাত হলো অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো প্রাণীর বিনাশ, পক্ষান্তরে গর্ভরোধের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্বের আবার নানান স্তর রয়েছে। এর প্রথম স্তর হলো, নারীর গর্ভাশয়ে বীর্য সঞ্চারণ এবং ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণু মিশ্রিত হয়ে জীবন গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি। একে (বিনা ওজরে) নষ্ট করা হলো অপরাধ ও গুনাহ। আর যদি সেটি থেকে ভ্রূণ হওয়ার পর ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে অপরাধ আরো জঘন্য হবে। ভ্রূণের আকৃতি পূর্ণ হয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর গর্ভ বিনষ্ট করলে জঘন্যতা আরো বাড়বে। জঘন্যতার সর্বশেষ স্তর হলো, জীবন্ত গর্ভপাতের পরে তাকে হত্যা করা।'[১]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিয়ে হলো একজন নারী ও পুরুষের মাঝে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট একটি মজবুত বন্ধন। তারা দুজন ছিল পৃথক, আল্লাহ তাদেরকে একত্র করে জোড়া বানিয়েছেন। সংখ্যার বিবেচনায় তারা প্রত্যেকে যদিও একক, কিন্তু বাস্তবে তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-প্রত্যাশার ভাগিদার—একটি জুটি। কুরআনে এই বন্ধনের চিত্রায়ন হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...﴿١٨٧﴾

তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ।[২]

[১] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

দত্তক সন্তান কি আপন সন্তানের স্বীকৃতি পাবে?

নিজ স্ত্রীর সন্তান অস্বীকারের সুযোগ যেমন ইসলামে নেই, তেমনিভাবে নিজের ঔরসজাত সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে নিজ-সন্তান বলে দাবির অধিকারও ইসলাম দেয় না। জাহিলি যুগে আরবের লোকেরা অন্যান্য জাতির মতোই যাকে ইচ্ছা তাকেই নিজের সন্তান বলে ঘোষণা দিয়ে দত্তকের মাধ্যমে বংশভুক্ত বানিয়ে নিতো। সবার মধ্যে ঘোষণা দিয়ে যেকোনো শিশু বা যুবককে তারা নিজ সন্তান হিসেবে নিতে পারত। এরপর থেকে সেই শিশু বা যুবক তার সন্তান ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত এবং তার জন্য সাব্যস্ত হতো আপন সন্তানদের মতো যাবতীয় অধিকার। সে ওই পরিবারের নামসহ পারিবারিক সকল অধিকারের ধারক হতো। এই শিশু বা যুবকের জন্মদাতা প্রকৃত পিতা সমাজে পরিচিত থাকলেও অন্যের পোষ্যপুত্র হতে তার কোনো সমস্যা হতো না।

ইসলাম আগমনের সময়েও আরব সমাজে দত্তক গ্রহণের প্রচলন ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। এমনকি জাহিলি যুগে যাইদ ইবনু হারিসা নামে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও একজন পোষ্যপুত্র ছিল। জাহিলি যুগের কোনো এক লুটতরাজে যাইদ ইবনু হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু আরবদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। সেসময় তিনি ছিলেন খুবই অল্পবয়স্ক বালক। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা হাকিম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু ফুপুকে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য তাকে ক্রয় করেছিলেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা আবার বিয়ের পরে এই গোলামটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়ে হিসেবে দিয়ে দেন।

বেশ কিছুদিন পরে যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাবা ও চাচা তার অবস্থান জানতে পারে। তারা এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার আবদার জানাল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অবকাশ দিলেন—সে চাইলে তার বাবা-চাচার সঙ্গে চলে যেতে পারে কিংবা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে যেতে পারে। যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকার সুযোগটিই বেছে নিলেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্প্রদায়কে সাক্ষ্য রেখে যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সেদিন থেকে তিনি (জাহিলি যুগের নিয়মানুসারে) 'যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ' নামে পরিচিত হলেন। ইসলাম আগমনের পর আযাদকৃত দাসদের

মধ্যে তিনিই প্রথম ঈমান আনেন।

জাহিলি দত্তকের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ইসলামের দৃষ্টিতে দত্তকপুত্রকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ বাস্তবতাবিরোধী একটি মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচার একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে একটি পরিবারের সদস্য বানিয়ে দেয়। সে এই পরিবারের নারীদের সঙ্গে মাহরামের মতো ওঠাবসা করে; অথচ তারা তার মাহরাম নয়। দত্তক গ্রহীতার স্ত্রী তার মা নয়, তার মেয়ে তার বোন নয়, তার বোন তো তার ফুফু নয়; বরং শরিয়তের দৃষ্টিতে সে সকলের জন্য গায়রে মাহরাম একজন পুরুষ।

এই কথিত সন্তান তার কথিত পিতা বা মাতা থেকে উত্তরাধিকারী হয়; অথচ প্রকৃত হকদারগণ বঞ্চিত হয়। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই সন্তানটির প্রতি প্রকৃত আত্মীয়গণ ভীষণরকম ক্রুদ্ধ হয়। কেননা, সে তাদের অধিকারে ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাদের পাওনা সম্পদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ক্রোধ ও হিংসা দানা বেধে ধীরে ধীরে এক সময় বিশৃঙ্খলা, সম্পর্কহীনতা ও রক্তসম্পর্ক ছিন্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এই জাহিলি রীতি ও চিরদিনের জন্য গড়া এই সম্পর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল অনুষঙ্গ হারাম। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝٤ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۝٥

আর তোমাদের পালকপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের (ঔরসজাত প্রকৃত) পুত্র করেননি। এগুলো তো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের (প্রকৃত) পিতৃপরিচয়ে ডাকো; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং তোমাদের বন্ধু।'[১]

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৪, ৫

লক্ষ করুন—

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ

(আর তোমাদের পালকপুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তো তোমাদের মুখের কথা মাত্র।) কুরআনের এই বাক্যটি নির্দেশ করছে, পোষ্যপুত্র এটি হলো একটি মুখের বুলি ও গালভরা কথা মাত্র, এর পেছনে কোনো বাস্তবতা নেই।

মৌখিক বুলি কোনো বাস্তবতা বা সত্যকে পাল্টাতে পারে না। অনাত্মীয়কে আত্মীয় এবং পোষ্যপুত্রকে ঔরসজাত পুত্রে রূপান্তর তার পক্ষে অসম্ভব। মৌখিক অনুশীলনের দ্বারা পালকপুত্রের মধ্যে পালক-পিতার রক্ত সঞ্চারিত হবে না, পিতার মধ্যে পুত্রসুলভ ভালোবাসা সৃষ্টি হবে না, সন্তানের মধ্যেও পিতৃত্বসুলভ আবেগ তৈরি হবে না। বস্তুত তার মধ্যে পিতার পারিবারিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব কিছুই স্থানান্তরিত হয় না।

ঔরসজাত পুত্রসংশ্লিষ্ট বিশেষ বিধিবিধান, যথা পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া, পিতার জন্য পুত্রবধু হারাম হওয়া এগুলো কিছুই পোষ্যপুত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পোষ্যপুত্রের জন্য উত্তরাধিকারে কোনো অংশ নেই। মিরাসপ্রাপ্তির জন্য রক্তসম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক বা জন্মগত আত্মীয়তার বাইরে কুরআনে আর কোনো কারণ বর্ণিত হয়নি। রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ...﴿٧٥﴾

আর আল্লাহর বিধানে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ (অনাত্মীয়দের অপেক্ষা) একে অন্যের অধিক হকদার।[১]

বিয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে যে, ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রী-ই (অর্থাৎ নিজের আপন ছেলের স্ত্রী তথা পুত্রবধুই) শুধু মাহরাম হিসেবে বিবেচিত হবে, পোষ্যপুত্রের স্ত্রীগণ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ...﴿٢٣﴾

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৭৫

আর তোমাদের জন্য (বিয়ে করা চিরস্থায়ীভাবে) হারাম করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রীদেরকে।[১]

তাই পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বাবা বিয়ে করতে পারবে; কারণ পালকপুত্র তো বাবার দিক থেকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় একজন ব্যক্তি। সুতরাং পালকপুত্র তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তার কথিত পিতার সাথে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিয়েতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই।

মৌখিক ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন

পালকপুত্র-সংক্রান্ত প্রচলনগুলো অনেকটা সামাজিক রীতির মতোই আরব সমাজের গভীরে শেকড় গেড়ে বসেছিল। তাই পালকপুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে পালকপিতার বিয়ের অনুমোদন অনেকের জন্যই বেশ কষ্টকর ছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা এই নিয়ম ভাঙার কথা শুধু বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁর নবির মাধ্যমে এর বাস্তবায়নও ঘটিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মুমিন-অন্তরের সকল দ্বিধা মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই মনোনীত হলেন এই সঙ্গিন দায়িত্ব পালনের জন্য। যাতে এর সঙ্গে জড়িত যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ নিঃশেষ হয়ে যায়। যেন মুমিনদের বিশ্বাস পোক্ত হয় যে, হালাল শুধু সেটাই, যা আল্লাহ হালাল করেছেন; আর হারাম শুধু সেটাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।

পূর্বেই আমরা বলে এসেছি যাইদ ইবনু হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে 'যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুপাতো বোন যয়নাব বিনতু জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মনোমালিন্য খুব বেড়ে যায়। যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীর ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রচুর পরিমাণে অভিযোগ জানাতে লাগলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহির মাধ্যমে আগেই অবগত হয়েছিলেন যে, যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যয়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দেবে এবং তিনি তাকে

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ২৩

বিয়ে করবেন। কিন্তু মানবিক দুর্বলতাবশত সমালোচনার আশঙ্কায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না, আল্লাহকে ভয় করো।'

এই ঘটনার পরেই কুরআনে নিজ জ্ঞানের বিপরীতে যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশের কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের ব্যাপারে কিছুটা তিরস্কার ও সতর্কবার্তা জানিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই তিরস্কারের পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের এই ভিত্তিহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন এবং জাহিলিযুগের অবশিষ্ট অমূলক রীতি ও সংস্কৃতিকে চিরতরে গুড়িয়ে দিতে প্রস্তুত হন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।' আর আপনি আপনার অন্তরে গোপন করছিলেন এমন কিছু, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান। আপনি লোকদের (সমালোচনার) ভয় পাচ্ছিলেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যখন যায়েদ তার (স্ত্রী যয়নাবের) সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে (অর্থাৎ আপনার পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাবকে) আপনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মুমিনদের পালকপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।[১]

তিরস্কারের পরেই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বিয়ের সমর্থন ও তার বৈধতাকে মজবুত করে, এ সংক্রান্ত সব

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৭

ধরনের দ্বিধা দূর করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

আল্লাহ তাঁর নবির জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা করতে তার জন্য কোনো বাধা নেই। (নবি-রাসুলদের মধ্য হতে) পূর্বে যারা অতীত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এটিই ছিল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী। তারা (পূর্বের নবি-রাসুলগণ) আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন, তাকে ভয় করতেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করতেন না। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।[১]

লালনপালন ও দেখভালের জন্য দত্তক-গ্রহণ

জেনেশুনে আরেকজনের সন্তানকে নিজ পরিবার ও বংশভুক্ত করে তার জন্য ঔরসজাত সন্তানের যাবতীয় বিধি-বিধান তথা উত্তরাধিকার, পরিবারের সবার সাথে পর্দাহীনভাবে অবাধে ওঠাবসা, বিয়ে হারাম ইত্যাদি সাব্যস্ত করা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম।

তবে আরেক ধরনের দত্তক আছে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। যেমন : অনেকে এতিম বা পথশিশুকে দত্তক নেয়। তাকে নিজের সন্তানের মতোই মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে লালন করে। ভরণপোষণ, শিক্ষা-দীক্ষার ভার সবই নিজ কাঁধে তুলে নেয়। সে অনেকটা আপন সন্তানের মতোই লালিত-পালিত হয়। কিন্তু পরিবারের কাছে সে তাদের বংশভুক্তও হয় না, আবার তার জন্য ঔরসজাত প্রকৃত সন্তানের বিধানগুলোও প্রযোজ্য করা হয় না। এটি অবশ্যই একটি ভালো ও প্রশংসনীয় নিয়ম। যারা এই কাজ করবে, তারা প্রতিদান হিসেবে জান্নাত পাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সুরা আহযাব , আয়াত : ৩৮–৪০

وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

> আমি ও এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবে। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং আঙুল দুটির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।[১]

'লাকিত' (لقيط) হলো পথশিশু, যাকে 'ইবনুস সাবিল' (ابن السبيل)ও বলা হয়। এ ধরনের শিশুদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদি কোনো লোক নিঃসন্তান হয় এবং সে তার পালকপুত্রকে সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে যেতে চায়, তাহলে সে জীবিত থাকাকালীন পালকপুত্রকে যা ইচ্ছা তা দান করে যেতে পারে, অথবা তার মৃত্যুর পরে তার সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তাকে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে যেতে পারে।

কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

ইসলাম ব্যভিচার ও দত্তকপুত্র গ্রহণকে হারাম ঘোষণা দিয়ে মানুষের বংশ-পরম্পরা রক্ষা করেছে। আর এর মাধ্যমেই পরিবারবহির্ভূত সকল উপাদান থেকে মুসলিমদের পরিবারব্যবস্থা নির্মল ও পবিত্র হয়েছে। পরিবারব্যবস্থাকে নির্মল ও স্বচ্ছ রাখতেই ইসলাম স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজননও হারাম ঘোষণা করেছে। বরং এটি আরো জঘন্য অপরাধ ও গুরুতর গুনাহের কাজ।

শাইখ শালতুত বলেন, 'স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন জঘন্য অপরাধ ও গুরুতর গুনাহের কাজ। এক বিবেচনায় কৃত্রিম প্রজনন তো ব্যভিচারের মতোই। কারণ, ব্যভিচার এবং কৃত্রিম প্রজননের মূল ও শেষ ফলাফল একই। আর তা হলো—নারীর গর্ভে শারয়িভাবে অনুমোদিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই একটি লোকের বীর্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে। অপরাধ সংঘটনের প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘাটতি না থাকলে এই কৃত্রিম প্রজনন শরিয়ার বিধানের বিবেচনায় ব্যভিচার বলে সাব্যস্ত হতো, যে ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ত হদ বা দণ্ডবিধির ব্যবস্থা রেখেছে এবং আসমানি বিধান নাযিল করেছে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৩০৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১৫০

উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় স্বামী ছাড়া অন্যের বীর্য নিয়ে কৃত্রিম প্রজনন অবৈধ। এটি দত্তক নেওয়ার চেয়েও অধিক গুরুতর অপরাধ ও নিকৃষ্ট কাজ। কারণ, কৃত্রিম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মানো সন্তানের মধ্যে শরিয়ায় দত্তক নিষিদ্ধের উপকরণ পুরোপুরিই বিদ্যমান। যেমন এক বংশের মধ্যে আরেক বংশের উপাদানের অনুপ্রবেশ, এছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবেরয়েছে ব্যভিচারের সঙ্গে সাদৃশ্য। এমন ঘৃণ্য কাজকে শরিয়াহ, আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান এবং একজন উন্নত রুচির মানুষ কখনোই সমর্থন করতে পারে না। এ ধরনের কাজে লিপ্ত হলে মানুষ ধীরে ধীরে একসময় পাশবিকতার স্তরে নেমে যাবে, যেখানে পারস্পরিক সম্মানের কোনো স্থান থাকবে না।'[১]

আপন বাবা ছাড়া অন্যকে বাবা বলা যাবে কি?

পিতার জন্য সন্তানের বংশ অস্বীকারের যেমন সুযোগ ইসলামে নেই, তেমনিভাবে বাবা ছাড়া অন্য কারো দিকে নিজের বংশ সম্পৃক্ত করাও বৈধ নয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় এটি একটি লানতযোগ্য জঘন্য কাজ বলে বর্ণিত হয়েছে। আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুতবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে তার সংরক্ষিত সহিফা থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শোনান—

وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا

> যে ব্যক্তি নিজের (জন্মদাতা প্রকৃত) পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করবে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের (আসল) মনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মনিব বলে দাবি করবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লানত। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোনো ফরজ কিংবা নফল কোনো ইবাদতই কবুল করবেন না।[২]

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১] *আল-ফাতাওয়া*, শাইখ শালতুত, পৃষ্ঠা : ৩২৮-৩২৯

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৩৭০; *জামিউত তিরমিযি* : ২১২৭